সময় বড় কম

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবির মূর্তির পাদদেশে

কবিকে তারাই বানিয়ে তুলেছিল, এই
ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে
তারা এখন
ছেনি ও হাতুড়ি নিয়ে
কবির মূর্তির পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাদ্রমাস ফুরিয়ে আসছে।
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরে টলটলে নীল আকাশকে এখন
সমুদ্র বলে ভ্রম হয়।
কিন্তু ঠিক এই সময়েই নীচের মাটিতে জমেছে তাদের
ভ্রান্তির খেলা।

কবি যে তাদের হুকুম মানতে রাজি হয়নি,
তাঁর এই অমার্জনীয় অপরাধের

শাস্তি হিসেবে
তারা বলছে, “আমরাই তাঁকে বানিয়েছিলুম, এখন
আমরাই তাঁকে ভাঙব।”

কিন্তু, তারা যদি না-ই বানাবে, তবে
কে বানিয়েছিল এই কবিবে?
বানিয়েছিল তাঁরই সময়।
তাঁরই প্রস্তুতিপর্বের নিরন্তর ব্যর্থতা ও গ্লানি,
অপমান ও যন্ত্রণা।

আজ যারা তাঁর মূর্তি ভাঙবার জন্যে
হাতুড়ি তুলেছে,
প্রাতিষ্ঠানিক সেইসব বর্বরের
অন্তহীন প্রতিরোধ ও ধিক্কারও অন্তত খানিক পরিমাণে তাঁকে
তৈরী করে তুলেছিল।

মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে তারা আজ আস্ফালন করছে।
কিন্তু তাদের জানা নেই যে,
তাদের অনিচ্ছার আগুনে ঢালাই হয়ে
তৈরী হয়েছে ওই মূর্তি।
কোনো হাতুড়িই ওই মূর্তিকে আর এখন ভাঙতে পারবে না।

ঘাটশিলা থেকে গয়েরকাটা

ঘাটশিলার কাছে
এন. এইচ. সিক্সের কুচকুচে কালো পিঠের উপর থেকে তার
দিনভর-রোদ্দুর-খেয়ে-গরম-হয়ে-ওঠা
শস্যের
শেষ কয়েকটি দানাকে খুব যত্নভরে
খুঁটে তুলতে-তুলতে
সাড়ে পাঁচ কাঠা জমির মালিক এক চাষি আমাকে বলেছিল,
হাইওয়ে হয়ে ইস্তক
এই তাদের একটা মস্ত উপকার হয়েছে যে,
রাস্তার উপরেই
দিব্যি এখন ধান শুনোনো যায়।

সূর্যদেব তখন
সারা আকাশে তার খুনখারাবি রঙের বালতি উপুড় করে দিয়ে
দিগন্ত-রেখার ঠিক নীচেই তাঁর
রক্তবর্ণ মুখখানাকে
আধাআধি লুকিয়ে ফেলেছেন।
সরকার বাহাদুরের কোনো প্রতিনিধি তখন
অকুস্থলে হাজির ছিলেন না।
থাকলে নিশ্চয়ই সরকারি সড়কের এই
অচিন্ত্যপূর্ব উপকারিতার কথা শুনে
তাঁর মুখও সেদিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠত।

কিন্তু এন. এইচ. থার্টিওয়ানের উপর দিয়ে যখন আমরা
গয়েরকাটার দিকে এগোচ্ছিলাম,
তখন ধান শুকোবার সময় নয়।
পাশের গাঁয়ের এক চাষি তখন তাই খুব মনোযোগ সহকারে
শাবল দিয়ে খুঁড়ে তুলছিল

হাইওয়ের পিচ।
পিচ দিয়ে কী হবে, জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেসে
সে আমাকে জানায় যে,
হাইওয়ে হয়ে ইস্তক আর রাংঝালের দরকার হয় না;
গোটা-গাঁয়ের ফুটো-বালতি আর ফাটা-গামলা এখন
পিচ গলিয়েই দিব্বি মেরামত হয়ে যাচ্ছে।

সরকার বাহাদুরের কোনো প্রতিনিধি সেদিনও
অকুস্থলে হাজির ছিলেন না।
একমাত্র সূর্যদেবই আমাদের কথোপকথনের সাক্ষী।
কিন্তু সূর্যদেব সেদিনও খুব লজ্জা পেয়েছিলেন নিশ্চয়।
গয়েরকাটার আকাশে তিনি আর তাই
খুনখারাবির খেলা দেখাননি।
গাঁয়ের চাষির সঙ্গে যখন আমার কথাবার্তা চলছে,
ফাঁক বুঝে তখন
টুক করে একসময় তিনি আংরাভাসা নদীর জলে তলিয়ে যান।

লালদিঘিতে বৃষ্টি

স্নানের পাট চুকিয়ে
মেঘের শাড়িখানাকে খুলে রেখে
আশ্বিনের খটখটে রোদ্দুরে নিজেকে শুকিয়ে নিচ্ছিল
আকাশ।
হঠাৎ চোখে পড়লে যে,
লালদিঘির মধ্যে তার ছবি দুটেছে, আর
হাঁ করে সেই

বেআব্রু ছবির দিকে তাকিয়ে আছে
বেহায়া একদল মানুষ।

কী ঘেন্না! কী ঘেন্না!
রাগে, অপমানে নিমেষে আবার কালো হয়ে গেল
আকাশের মুখ।
চড়চড় করে বৃষ্টি নামল তক্ষুনি। আর
মাথা বাঁচাবার জন্যে
পালাতে-পালাতেই লোকগুলো দেখতে পেল যে,
বৃষ্টি ছর্‌রায়
জলের স্থির আয়নাখানা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

সময় বড় কম

কলিং বেল বেজে উঠতেই
দরজার আই-হোল্‌-এ উঁকি মেরে যাকে দেখতে পেলুম,
তার চোখের কোনো চামড়া নেই, আর
গায়ের চামড়া ছাইবর্ণ।
চিনতে একটুই অসুবিধে হল না; কেননা
এর আগে আরও
সাত-আটবার এই লোকটিকে আমি দেখেছি।

শেষ দেখি ছিয়াত্তর সালে, যমুনোত্রীর পথে।
আলগা একটা পাথরে ঠোকর খেয়ে আমার ঘোড়াটা যখন
খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে,
সামনের পাহাড়ের চূড়ায় তখন ওকেই আমি

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম।
পথের উপরে ঝুঁকে-পড়া একটা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে
সেবারে আমি বেঁচে যাই।

মুখটা আমি চিনে রেখেছি। তাই ওকে
দেখবামাত্র আমার বুকের রক্ত ছল্‌কে ওঠে। আমি বুঝতে পারি
মৃত্যু আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আজও কি ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব?
কথাটা ভাবতে-ভাবতেই আমি
ঘুরে দাঁড়াই, এবং জীবনের হাত-দু'খানা আঁকড়ে ধরে বলি,
"সময় বড় কম,
এসো, আর দেরি না-করে আমাদের ঝগড়াটাকে এবারে
মিটিয়ে নেওয়া যাক।"

জীবন বলতে যে ঝগড়ুতে প্রেমিকার কথা আমি বোঝাচ্ছি,
স্পর্শ করবামাত্র তার মুখের উপরে এক
টকটকে রক্তাভা ছড়িয়ে যায়। আর
চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে ভোরবেলাকার রহস্যময় আলো।
মুখ নামিয়ে সে বলে,
"কিন্তু কলিং বেল যে বেজেই যাচ্ছে।"

তৎক্ষণাৎ তার কথার কোনো জবাব আমি দিই না।
জীবনকে আমি আমার বুকের মধ্যে টেনে নিই।
তারপর তার শরীরের
উষ্ণ আর্দ্রতার মধ্যে ডুবে যেতে-যেতে বলি,
"বাজুক।
এখন আর আমার কোনো তাড়া নেই।"

সাদা বাড়ি

সবকিছুরই শেষে থাকে
একটা মস্ত
ধপধপে আর খুব প্রশস্ত
সাদা বাড়ি।
কেউ সেখানে জ্যোৎস্না-রাতের গন্ধবহ সাবান মাখে,
কেউ একাগ্র দেউল-চূড়ার ছবি আঁকে,
কেউ সেখানে জলের ঝারি
হাতে নিয়ে গোলাপ-বনে ঘুরে বেড়ায়।

বুকের মধ্যে শব্দগুলি জমতে-জমতে হারিয়ে যায়,
শেষ হয়ে যায় সকল কথা।
বুঝতে পারি এখন ক্লান্ত
গয়নাগাঁটির ভিতর থেকে খুব প্রশান্ত
অন্যরকম ঘরসংসার মাথা তুলেছে।
বুঝতে পারি, এই মুহূর্তে জানলা এবং দরজা খুলছে
স্তব্ধ বিশাল সাদা বাড়ি।